বিজ্ঞানপত্রিকা 'প্রোসিডিংস অফ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' এ-বিষয়ে প্রকাশ করেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাওয়ার্ড হিউজ় মেডিকাল ইনস্টিটিউটের গবেষক ডঃ ব্রুস টি লান ও তাঁর সহকারীরা বিস্তারিত গবেষণার শেষে জানিয়েছেন, ইউরোপে বসবাসকারী নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে কখনও না কখনও প্রজনন ঘটেছিল হোমো স্যাপিয়েন্সদের, এবং আজ মানুষের পৃথিবী-ছাপানো অগ্রগতির পিছনে সেই ঘটনার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়ে গেছে। আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পিছনে আদি মানবগোষ্ঠীর অন্য কোনও স্বতন্ত্র শাখার কোনও অবদান আছে কি না, থাকলে তা কতখানি, এ নিয়ে যে-বিতর্ক চালু আছে বিজ্ঞানমহলে, এই আবিষ্কার তাতে নতুন ইন্ধন জোগাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

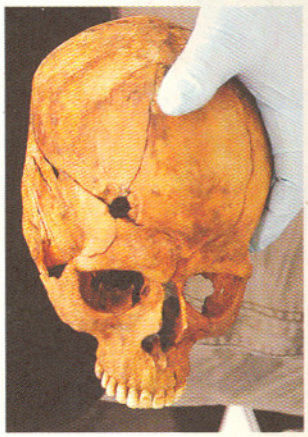

আধুনিক মানুষ *হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স*-এর মস্তিষ্কের আধুনিক গঠনের পিছনে ক্রিয়াশীল কিছু বিশেষ জিনকে আগেই শনাক্ত করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ আমাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পিছনে মস্তিষ্কের যে-গঠনগত জটিলতা দায়ী, তা এই জিনগুলির দান। এগুলির মধ্যে অন্যতম একটি জিন, 'মাইক্রোকেফালিন' (micro-cephalin) নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মস্তিষ্কের আকার ও গঠন। লান এবং তাঁর সহযোগীদের দাবি, 'মাইক্রোকেফালিন' নামক বিশেষ জিনটি সম্ভবত আধুনিক মানুষ লাভ করেছে কোনও আদি মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে। খুব সম্ভবত ইউরোপে যে-নিয়ানডার্থালরা একসময় বসবাস করত, তাদের সঙ্গে সত্যিই কখনও না কখনও প্রজনন ঘটেছিল আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো স্যাপিয়েন্স-দের। অতি সীমিত অবদান, কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী পরিণতির কথা মনে করে নিয়ানডার্থালদের অংশত আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করলে বোধহয় খুব ভুল হবে না।

জিনের নির্দেশমাফিক তৈরি হয় প্রোটিন এবং সেগুলিই শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীরের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক নামক বস্তুটিও এই জিনের পরিচালনপদ্ধতির আওতার বাইরে নয়। মাইক্রোকেফালিন জিনটি ভ্রূণদশায় নির্মীয়মাণ মস্তিষ্কের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে। যে-আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই জিনটির প্রথম আত্মপ্রকাশ তা সম্ভবত আধুনিক মানুষের ধারা থেকে ১১ লক্ষ বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে এই মাইক্রোকেফালিন (MCPH1) জিনটি মিউটেশনের দ্বারা মাইক্রোকেফালিন 'টাইপ ডি'তে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, লান ও তাঁর সহকারীরা দেখেছেন, আদি মনুষ্যশাখার মাইক্রোকেফালিন টাইপ ডি জিনগুলি ৩৭০০০ বছর আগে কোনও প্রকারে এসে ঢুকেছে আধুনিক মানুষের জিনসম্ভারে!

এই ঘটনাই ইঙ্গিত করছে, আদি মনুষ্যগোষ্ঠীর কোনও শাখার সঙ্গে আধুনিক মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই আদি মানবগোষ্ঠীটি খুব সম্ভবত নিয়ানডার্থাল মানুষ। এই সংমিশ্রণ ঠিক কতখানি ব্যাপক হারে ঘটেছিল, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁরা এখনও সন্দিহান। সাক্ষ্য মিলেছে যে, সম্ভবত অন্তত একবার এটি ঘটেছিল, যার ফলে ক্রমশ আরও উপকারী হয়ে ওঠা (beneficially modified) জিনটি বংশানুক্রমে প্রবেশ করেছে আধুনিক মানুষের শরীরে। যার বলে, হয়ত পরিহাসের মতো শোনাবে, একদিন এই নিয়ানডার্থালদেরই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়েছিল আধুনিক মানুষ।

ট্যাগিশ্ উল্কাপিণ্ড শুধু পুরনো নয়, হয়তো তাদের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণের জন্মপত্রিকাও লুকিয়ে আছে। লিখছেন বিমান নাথ

বহু যুগের ও পার হতে

মাটি খুঁড়তে গিয়ে পুরনো মোহর পাওয়ার গল্প এখন আর তেমন শোনা যায় না। কিন্তু প্রায় সেইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। ঠিক মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া নয়, জিনিসটা এসেছে আকাশ ফুঁড়ে। আর তার মধ্যে এমন সব কিছু পাওয়া গেছে যার কথা শুনে সত্যি আকাশ থেকে পড়তে হয়! কানাডার পশ্চিম কূলে, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার যে-অংশে ইউকন্ গোষ্ঠীর আদিবাসীরা থাকেন, সেখানে ২০০০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সকালে একটা মাঝারি সাইজ়ের উল্কা এসে পড়েছিল।

বি জ্ঞা ন ৩

আকাশে পরপর কয়েকবার বিস্ফোরণ ঘটানোর পর উল্কাটার টুকরোগুলো এসে পড়ে বরফ আচ্ছাদিত ট্যাগিশ্ হ্রদের ওপর। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তার আগুনের হলকার ঝলক নাকি কয়েক সেকেন্ডের জন্য দিনের আলোকেও হার মানিয়ে ছিল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বরফে গেঁথে থাকা উল্কাপিণ্ডের অনেক টুকরো খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু এমন তো কত উল্কাই মুড়ি মুড়কির মতো আকাশ থেকে পড়ে। প্রতিদিন পুরো পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষ কিলোগ্রাম উল্কার ধুলোবালি ঝরে পড়ছে! তবে বেশিরভাগ সময় এই সব উল্কার টুকরো খুঁজে পাওয়ার আগেই পৃথিবীর আবহাওয়া কলুষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু 'ট্যাগিশ্ উল্কা'-র অংশগুলো সংগ্রহ করতে বেশি সময় লাগেনি, তাই বিজ্ঞানীদের আশা ছিল যে, উল্কাটার মধ্যে সত্যিকার মহাকাশের, অপার্থিব জিনিসের চিহ্ন পাওয়া যাবে।

'ট্যাগিশ্ উল্কা' তাঁদের নিরাশ করেনি। এমনিতেই উল্কাটার পদার্থ ছিল বেশ ঝুরঝুরে—যা সাধারণত খুব প্রাচীন উল্কার চিহ্ন বলে মানা হয়। তারপর এর মধ্যে পাওয়া গেছে খুব ছোট (এক মিলিমিটারের হাজার ভাগ ছোট) দানার মতো জৈব পদার্থের সমষ্টি। দানাগুলো গোলাকার, কিন্তু তার ভেতরটা ফাঁপা—এক একটা খোলের মতো। এমন জিনিস আগেও কিছু উল্কায় দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পৃথিবীর

জল-বাতাস দ্বারা দূষিত হওয়ার ফল কি না সেটা কখনওই সঠিক করে বলা যায়নি। আর ট্যাগিশ্ উল্কাপিণ্ডের খোলগুলোর স্বরূপ পরিষ্কার বোঝা গেছে, আগের উল্কাপিণ্ডগুলোর মতো সেগুলি তেমন অস্পষ্ট নয়।

এই ফাঁপা দানাগুলোর মধ্যে নানা ধরনের পদার্থের অনুপাত বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে পরমাণুর ওজনের রকমফের হয়—কখনও একটা নিউট্রন কম বা বেশি থাকার জন্য কোনও পরমাণু খানিকটা হালকা বা ভারী হতে পারে। যেমন ভারী জলের হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটা বাড়তি নিউট্রন রয়েছে। এর জন্য তার রাসায়নিক ধর্ম পাল্টায় না, শুধু ওজন বদলায়। 'নাসা'-র বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ট্যাগিশ্ উল্কাপিণ্ডের দানাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুর অনুপাত পৃথিবীতে সচরাচর যে-ধরনের অনুপাত লক্ষ করা যায়, তার থেকে খুব আলাদা।

যেমন, বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কোনও কোনও দানার মধ্যে সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী হাইড্রোজেনের (অর্থাৎ ডিউটেরিয়াম) অনুপাত পৃথিবীর হাল আমলের অনুপাতের চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি। নাইট্রোজেনের অনুপাতেও গোলমাল পাওয়া গেছে। তাঁদের মতে এর কারণ খুব সম্ভবত এই যে, এই দানাগুলোর জন্ম হয়েছিল মহাকাশের কোনও অন্ধকার, হিমশীতল মেঘের গভীরে, যেসব মেঘে নতুন নক্ষত্র জন্ম নেয়। অর্থাৎ, যে-মেঘ থেকে আমাদের সূর্যের জন্ম হয়েছিল, এই ফাঁপা দানাগুলো সেই মেঘের ভেতরে, সূর্যের জন্মের আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট ছোট বরফের টুকরোর ওপর জৈব অণুর স্তর সৃষ্টি হয়েছিল মহাকাশে; এক সময় নতুন নক্ষত্রের প্রখর আলোয় সেই বরফ উবে গিয়ে শুধু অণুর ফাঁপা খোলটা রয়ে গেছে। (এই প্রক্রিয়ায় খোলের বাইরের আবরণ কতটুকু পুরু হওয়া সম্ভব, তার তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে ট্যাগিশ্ উল্কার খোলগুলোর মাপ মিলে যায়!)

এর পরে কখনও উল্কাটার সৃষ্টির সময় এই দানাগুলো তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল প্রাচীন মোহরের মতো এই দানাগুলোকে।

শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছে এক রাশ প্রশ্ন। যে-সব জৈব অণু 'ট্যাগিশ্ উল্কা'-র মধ্যে পাওয়া গেছে, সেগুলো বেশ জটিল, যা দিয়ে তৈরি হতে পারে জীবকোষের উপকরণ। এমন সব জটিল জৈব অণু যে মহাকাশে ছড়িয়ে আছে তার প্রমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই পেয়েছেন। কিছু কিছু উল্কাপিণ্ডেও আগে এমন অণু পাওয়া গিয়েছিল—তবে ওই সব ক্ষেত্রে অণুগুলো পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে ঢুকেছে কি না, সেই সন্দেহ পুরোপুরি নিরসন হয়নি।

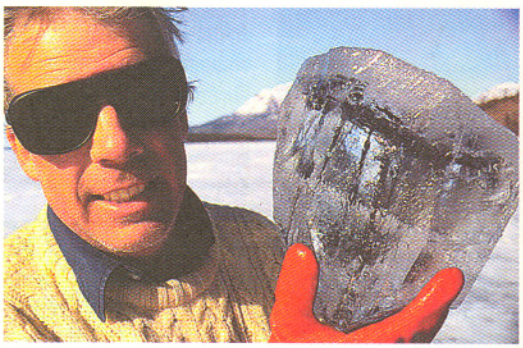

এইবার যেহেতু ট্যাগিশ্ উল্কার জৈব অণুর ফাঁপা খোলগুলো অতি প্রাচীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, এই প্রশ্নটা তাই আবার জেগে উঠেছে—তাহলে কি এইভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল? এইরকম কিছু জটিল জৈব অণু কি মহাকাশ থেকে কোনও উল্কার জঠরে করে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' এসে পড়েছিল আদিম, প্রাণহীন পৃথিবীতে?

দেখা যাচ্ছে ট্যাগিশ্ উল্কাপিণ্ডের জৈব অণুর খোলগুলো হঠাৎ খুঁজে পাওয়া মোহরের মতো শুধু পুরনো নয়, হয়তো তাদের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণের জন্মপত্রিকাও লুকিয়ে আছে।

'হার্ট অফ বোর্নিও'-র গহন অরণ্যে পাওয়া গেল নতুন প্রজাতির সন্ধান, যাদের সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না আগে! লিখছেন ইমন চক্রবর্তী

বৃষ্টিঅরণ্যে নতুনের সন্ধান

কঙ্গো ও আমাজন অববাহিকাকে বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যতম আদিম, অকৃত্রিম, দুর্ভেদ্য বৃষ্টিঅরণ্যের (Rain Forest) সন্ধান পাওয়া যাবে বোর্নিও দ্বীপে। অবশ্য সভ্যতার থাবা এসে পড়েছে এখানেও। মাইলের পর মাইল বনজঙ্গল সাফ করে তৈরি হচ্ছে কৃষিজমি, বসতি অঞ্চল বা রাস্তাঘাট। এসব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে কাঠের প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদনের পরিমাণ, যার বেশ বড় অংশই হয় বেআইনিভাবে। বর্তমানে টিকে আছে বনভূমির মাত্র ৫০%, যেখানে আটের দশকেও তার পরিমাণ ছিল মোটের তিন-চতুর্থাংশ। উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চল থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে হতে বনভূমির অস্তিত্ব এখন গিয়ে ঠেকেছে দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে ২২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের অতি সীমিত পরিসরে, যার বাহারি নাম 'হার্ট অফ বোর্নিও'। সুমাত্রা ছাড়া একমাত্র এই অঞ্চলেই খুঁজে পাওয়া যায় ওরাং-ওটান, হাতি ও সুমাত্রার গণ্ডারের মতো তিনটি 'বিলুপ্তপ্রায়' তালিকাভুক্ত প্রাণীর বিরল সহাবস্থান। কিন্তু সেখানেও যে শুরু হয়ে গেছে কাউন্টডাউন!

'হার্ট অফ বোর্নিও'-র ভবিষ্যৎ নিয়ে এই গেল গেল রব যখন প্রবল, ঠিক তখনই সেখানে পাওয়া গেল এক চাঞ্চল্যকর খবর। ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে এই গহন অরণ্যের আনাচ কানাচ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে এমন ৫২টি নতুন প্রজাতি, যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাই আগে ছিল না! এদের মধ্যে রয়েছে মাছের তিরিশটি অভিনব প্রজাতি; দুটি গেছো ব্যাঙ; আদাগোত্রীয় উদ্ভিদের ১৬টি নতুন প্রজাতি; তিনটি নতুন বৃক্ষ এবং একটি বৃহৎপত্রযুক্ত উদ্ভিদ। নব আবিষ্কৃত একটি মাছ—লম্বা দাঁতওয়ালা ক্যাটফিশ, তার আঠালো পেটের সাহায্যে নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে দিব্যি নিজেকে আটকে রাখতে পারে পাথরের গায়ে। হঠাৎই তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে ইন্দোনেশিয়ার কাপুয়াস নদীতে। সদ্য আবিষ্কৃত একটি গেছো ব্যাঙ যে-কাউকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে তার আশ্চর্য উজ্জ্বল সবুজ চোখের বাহারে। অথবা মাত্র ০.৮৯ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের যে-মাছকে খুঁজে পাওয়া গেল অতি-আল্পিক পিট-সোয়াম্প থেকে, সেই কিনা পেয়ে গেল পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম মেরুদণ্ডী প্রাণীর শিরোপা!

জী ব বৈ চি ত্র

শুধু কি তাই! ফ্ল্যাশব্যাক দেখাচ্ছে ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যেও এখানে পাওয়া গেছে প্রায় ৩৬১টি নতুন প্রজাতির সন্ধান। কে নেই তাদের মধ্যে—হরেক কিসিমের পোকামাকড়, টিকটিকি, সাপ